কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট

৩৪

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দুর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অথচ এ উন্নয়নের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা, সে সব বিষয়ে আলোচনা খুবই সীমিত। যাদের উদ্দেশ্য করে এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায় থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, এ উন্নয়নের ফল সবাই সমানভাবে পাচ্ছে কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় সমাজের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে ২০২২ সালের ১ অক্টোবর রাঙামাটিতে একটি নাগরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। ওই সভায় তিন পার্বত্য জেলা থেকে নাগরিকদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

নাগরিক পরামর্শ সভা: রাঙামাটি

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও স্থানীয়দের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন হতে হবে

সূচনা বক্তব্য

প্রারম্ভিক বক্তব্যে সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, আমরা উন্নয়নের যে উপাখ্যান আলোচনা করি, তা অনেকাংশে গড় ভিত্তিক হিসাবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই গড়ের হিসাবে মধ্যে যাদের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার, তাদের বিষয়টি হারিয়ে যায়। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে দেখা যায়, গত ১৫ বছরে পার্বত্য জেলাগুলো একেবারে খারাপ করেনি। কিন্তু দারিদ্র্যের জাতীয় গড়ের দিকে যদি লক্ষ করি, তাহলে দেখা যাবে এ জেলাগুলো জাতীয় দারিদ্র্য রেখা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের মূল জানার বিষয় হলো, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত কারণে ভিন্ন। একেক অঞ্চলের একের ধরনের নিজস্বতা রয়েছে। সেই পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো সবাইকে একইভাবে স্পর্শ করছে কি না, সেটি অনুধবন করাই এ পরামর্শ সভার উদ্দেশ্য। আমরা জানতে চাই, সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ নিয়েছে; সেগুলো সব এলাকার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, নাকি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য ভিন্ন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এসব বিষয়ে স্থানীয় নাগরিকদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানার লক্ষ্যেই আজকের এ আয়োজন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিনিধি বলেন, এসডিজির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না।' একটি দেশের অর্থনীতি উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে বড় হতে পারে। কিন্তু সেই উন্নয়নের সুফল যদি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় না পৌঁছে, তাহলে সে উন্নয়ন অর্থবহ হয় না। কারণ সমাজে একটি ধনিক শ্রেণি ও একটি দুর্বল শ্রেণি সৃষ্টি হওয়া আমাদের কাম্য নয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রাপ্য অংশ যদি প্রত্যেক নাগরিকের কাছে না পৌঁছে, তাহলে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হবে না। কাজেই সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কণ্ঠস্বর যাতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে এবং তার আলোকে যাতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক নীতি পরিকাঠামো প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়, সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

সংসদ সদস্যরা দলীয় মতাদর্শের বাইরে কোনো কথা বলেন না

আলোচনায় অংশ নেওয়া খাগড়াছড়ির এক প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, তিন পার্বত্য জেলা থেকে যারা জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন, তারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকেই নির্বাচিত হন; কিন্তু তারা সংসদে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হয়ে তেমন কোনো কথা বলতে পারেন না। এক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ একটি বড় বাধা। এই অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতার কারণে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য তার দলের মতাদর্শের বাইরে কোনো কথা বলতে পারেন না। সরকারের উচিত হবে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে যাতে সংহতি বজায় থাকে, তারা যাতে উপদলীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এসব উপদলের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে, যার ফলে বাস্তুচ্যুত অনেক আদিবাসী এখনো পুনর্বাসিত হতে পারেননি। তাছাড়া পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয় না। একই সঙ্গে উন্নয়নের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রভাবশালী মহলের ভূমি দখল ও স্থাপনা নির্মাণ চলছে দেদার।

সংরক্ষিত কমিউনিটি বনাঞ্চল সরকারের স্বীকৃতি পাচ্ছে না

বক্তারা উল্লেখ করেন, নেপালে কমিউনিটি বন সংরক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলেও এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হতে পারে। এ বিষয়ে আরেক বক্তা উল্লেখ করেন, ১৯০০ সালের "হিলট্রাক্টস ম্যানুয়ালের ৪১ বিধি" অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি মৌজায় একটি করে সংরক্ষিত কমিউনিটি বনাঞ্চল থাকার কথা। বর্তমানে সরকার ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)'র সহায়তায় ভিলেজ কমন ফরেস্ট বা ভিসিএফ বা মৌজা বন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তবে এগুলোর জন্য পাহারাদার না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে 'সেটেলার' জনগোষ্ঠী সেসব বনের গাছ কেটে নিয়ে যায়। আর পাহাড়ি ও সেটেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা থেকে এক্ষেত্রে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয় না। তাছাড়া হেডম্যানদের তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট এই বন এখনো সরকারিভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ১৯০০ সালের হিলট্র্যাক্টস ম্যানুয়ালের বিধান অনুসারে হেডম্যানরা মৌজাভিত্তিক সংরক্ষিত বন দেখভাল করছেন এবং ইউএনডিপি এ কাজে সহায়তা করছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত বন রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের বন বিভাগের। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মৌজাভিত্তিক বনগুলো সংরক্ষিত বনের স্বীকৃতি না পাওয়ায় এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে এখনো ঝুঁকি রয়ে গেছে। এ বনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে যতটুকু এলাকা জুড়ে বনটি আচ্ছাদিত, তার সীমানা উল্লেখসহ এ বনের সরকারি স্বীকৃতি প্রয়োজন বলে বক্তারা মনে করেন। তবে ইউএনডিপির সহায়তায় এরই মধ্যে উজাড় হয়ে যাওয়া বনভূমি এলাকায় আবার বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে এবং সেগুলো সরকারের বনবিভাগ দেখভাল করছে বলে পরামর্শ সভায় তুলে ধরা হয়।

শান্তিচুক্তির এখনো পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি

বক্তারা উল্লেখ করেন, ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি হওয়ার আগে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা পরবর্তী সময়ে দেশে ফিরে আসার পর তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও পুনর্বাসনের বিষয়ে চুক্তিতে উল্লেখ ছিল। কিন্তু এসব বিষয় এখনো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া পর্যটন শিল্পের বিকাশের ফলে নতুন নতুন হোটেল ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে। এসব স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো মতামত নেওয়া হয় না এবং শত শত বছর ধরে যারা এসব ভূমিতে বসবাস করছেন, তাদের উৎখাত করে স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে।

ভারত থেকে প্রত্যাগত সশস্ত্র বিদ্রোহ করা একটি পরিবারের একজন সদস্য উল্লেখ করেন, শান্তিচুক্তিতে প্রত্যাগত ও দেশে অবস্থানকারী মিলে প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার মানুষের পুনর্বাসনের কথা ছিল। পুনর্বাসনের মধ্যে ছিল তাদের জন্য ঘরবাড়ি ও সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ, যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উপরন্তু যারা চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে নানা সময়ে দাবি তুলেছেন, তাদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া সহ নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে।

সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেওয়া একটি পরিবারের সদস্য জানান, ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, শান্তিচুক্তি হওয়ার পর তারা দেশে ফিরে আসেন। ভারত থেকে প্রত্যাগত ও দেশীয় বিদ্রোহী মিলে মোট এক লাখ ৪০ হাজার মানুষের পুনর্বাসনের বিষয়ে শান্তিচুক্তিতে উল্লেখ ছিল। এসব পুনর্বাসনের মধ্যে ছিল ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া, ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা, যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের ব্যবস্থা করা, সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রভৃতি। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর তাদের পুনর্বাসনের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এখন শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়ে যারা দাবি তোলেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া সহ নানাভাবে হয়রানি করা হয়। একটি মহল আদিবাসীদের ভূমি জোর করে দখল করে বিক্রি করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর ভূমিকা না রাখায় একটি যাযাবর জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে এক বক্তা উল্লেখ করেন।

রামুক্যাছড়ি নামক একটি মৌজার কথা উল্লেখ করে এক বক্তা বলেন, সেখানে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনা ছাড়া অন্য কোনোকিছুই নেই। এছাড়া শান্তিচুক্তি প্রণয়নের সঙ্গে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) যুক্ত ছিল, সেই সংগঠন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে এবং বিভিন্ন সশস্ত্র উপদল সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সম্মিলিত আওয়াজ তুলতে পারে না। তাছাড়া পাহাড়ে সিভিল প্রশাসনের উপস্থিতি খুবই নগণ্য বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। এর ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা হলে তাদের প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তাছাড়া পাহাড়ে সেটেলার হিসেবে যারা বিবেচিত, তাদের দ্বারা প্রায়ই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়, কিন্তু কোনো প্রতিকার পায় না বলে এক বক্তা অভিযোগ করেন।

বক্তারা জানান, শান্তিচুক্তির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন গড়ে উঠলেও তা অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। এ কমিশনের মাধ্যমে পাহাড়িদের ভূমির মালিকানা দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। পাশাপাশি শান্তিচুক্তির ৭০টির অধিক ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও এ চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। সরকার শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে পড়ায় এ চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জোরালো করতে 'পাবর্ত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে বলে আলোচকরা জানান। চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন সময়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও

তারা জানান। কিন্তু এতকিছু করা সত্ত্বেও শান্তিচুক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি নারীরা নির্যাতনের শিকার হলেও তারা অনেক সময়েই যথাযথ বিচার পান না। পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ কোনো মতেই কাম্য নয়।

বিদ্যালয়ের সংকট ও দারিদ্র্য শিক্ষার জন্য বড় বাধা

বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ি জনপদে বাল্যবিয়ের উপস্থিতি এখনো প্রকট। এর প্রধান কারণ হলো, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কাছাকাছি ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকা। অনেক ক্ষেত্রে হাইস্কুলে যাওয়ার জন্য একজন মেয়ে শিক্ষার্থীকে সাত থেকে আট কিলোমিটার দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। এক বক্তা উল্লেখ করেন, চিম্বুক এলাকায় এমনও স্থান আছে যেখানে ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো হাইস্কুল নেই। চিম্বুকের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের উদ্ধৃতি দিয়ে এক বক্তা বলেন, চার বছর আগে তার স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছিল ১০০ জনের মতো শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে নবম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে পেরেছে মাত্র সাতজন। বাকিদের ঝরে পড়ার প্রধান কারণ চরম দারিদ্র্য ও কাছাকাছি এলাকায় হাইস্কুল না থাকা। এমনকি বান্দরবানের রুমা, থানচি, নাইক্ষ্যংছড়ির মতো উপজেলাগুলোয় এখন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অত্যন্ত অপ্রতুল, যে কারণে ওইসব উপজেলার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে না। তবে কিছু কিছু এলাকায় সরকারের উদ্যোগে স্কুল ও কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে বলে বক্তারা জানান। এগুলো থেকে সাধারণ মানুষ সেবা নিচ্ছে।

শিক্ষার বিষয়ে আরেক বক্তা বলেন, সরকার জানিয়েছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেন নিজেদের উদ্যোগে কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠা না করেন। প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সরকার সব জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ে এমনও এলাকা আছে যেখানে আট কিলোমিটারের মধ্যে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। একটি পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে তো কোনোভাবেই এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে স্থানীয় নাগরিকরা। এসব স্কুলের সরকারি স্বীকৃতি প্রয়োজন বলে ওই বক্তা মনে করেন।

ভূমি দখল ও বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়া

অংশগ্রহণকারীরা জানান, পাহাড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটছে, এটি ভালো। কিন্তু পর্যটনের হাত ধরে অনেক বিপদ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর ভর করছে। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বড় করপোরেট গ্রুপের উদ্যোগে স্থানীয়দের জমি জোরপূর্বক দখল হয়ে যাওয়া এবং সেখানে পাঁচতারা মানের হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ। যদিও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদের মুখে বর্তমানে হোটেল নির্মাণের কাজ বন্ধ রয়েছে, কিন্তু যে কোনো সময় ফের স্থাপনা নির্মাণ শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। আর পর্যটনকেন্দ্রিক বিভিন্ন স্থাপনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হলেও, স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অনেকের ঘরে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছেনি বলে বক্তারা জানান।

বিভিন্ন ভাষার অবলুপ্তি ও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি

পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে এক বক্তা উল্লেখ করেন। একটি ভাষার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে ওই ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। বর্তমানে তা ছয় জনে নেমে এসেছে। যদিও স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নানা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রাখছে না।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আরেক পাহাড়ি নাগরিক উল্লেখ করেন, সরকার এসডিজির বিভিন্ন সূচক ধরে পাহাড়ে উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলে দাবি করছে। এমন একটি সূচক হচ্ছে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দেওয়া। ২০১৭ সালে সরকার আদিবাসীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় বই প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে এসডিজির নির্দিষ্ট সূচক অর্জনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সরকারের দাবি। কিন্তু সেই বই শ্রেণিকক্ষে পড়ানো হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে কোনো তদারকি নেই। এ বই যাতে পড়ানো হয়, সেজন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকদের তৈরি করার দাবি জানান তিনি।

সুপেয় পানির অভাব

পাহাড়ি অঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। চিম্বুক থেকে আসা এক প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, বড় বড় গাছ কেটে ফেলা এবং পাহাড় থেকে পাথর অপসারণ করে ফেলার কারণে পানির সংকট আরও তীব্রতর হচ্ছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে দীর্ঘ দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এমনকি টাকা দিয়ে পানি কিনতে হয়। গাছ কাটা ও পাথর উত্তোলনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সময় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছে। এমনকি এ সমস্যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারও করা হয়েছে। তারপরও বন উজাড়িকরণ ও ঝিরি-ঝরনা থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধ হয়নি। বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ে সুপেয় পানির এতটাই সংকট যে, নারীদের পানি সংগ্রহের জন্য দূরদূরান্তের দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। সেই ঝরনা এতটাই দূরে অবস্থিত যে, পরিবারের নারী সদস্যদের রাত আড়াইটা-তিনটার দিকে বাড়ি থেকে রওনা দিতে হয়। তারপর ঝরনা থেকে চুইয়ে পড়া পানি কন্টেইনারে ভরে বাড়িতে আসতে পরের সকাল ১০টা বা ১১টা বেজে যায়।

বক্তারা জানান, সড়ক উন্নয়নের জন্য ইট দরকার। সেজন্য ইটভাটা তৈরি করা হয়েছে। আর সেই ভাটার জ্বালানির জন্য বিপুলসংখ্যক গাছ কাটা হচ্ছে পাহাড় থেকে। পাশাপাশি পাহাড়ের মাটি কেটে ইট তৈরি করা হচ্ছে।

বিভিন্ন কার্যক্রমে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রভাব

এক বক্তা উল্লেখ করেন, পাহাড়ে ১০টির অধিক আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বাস করলেও ইউএনডিপির প্রকল্পসহ বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমে মাত্র তিনটি গোষ্ঠীর মানুষের প্রাধান্য বেশি। ইউএনডিপির একটি প্রকল্পের সূত্র উল্লেখ করে ওই বক্তা বলেন, এ প্রকল্প থেকে একটি জনগোষ্ঠীর ৬৫ শতাংশের সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। অন্য দু'টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটির ২৩ শতাংশ এবং অন্যটির ২২ শতাংশ জনগোষ্ঠী সুবিধা পাচ্ছে। এর বাইরে অন্য যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, তারা কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ইউএনডিপির প্রকল্পের সুবিধা বিতরণেও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু এসডিজিতে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে টেনে তোলার কথা বলা হয়েছে, তাই এমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানানো প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক। ২০১০-১১ সময়ের দিকে ইউএনডিপি এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল বলে ওই বক্তা উল্লেখ করেন।

জুম চাষিদের জন্য সরকারি সুবিধা প্রাপ্তিতে জটিলতা

বক্তারা জানান, সরকারের কিছু সুবিধা আছে জুম চাষিদের জন্য। এক্ষেত্রে ডিসি অফিস থেকে বলা হয়, ওই সুবিধাটি পেতে হলে পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সমান হতে হবে। কিন্তু বাঙালিরা তো জুম চাষ করে না। তাহলে বাঙালি জুম চাষি কোথা থেকে আসবে? এ ধরনের শর্তের বেড়াজালের কারণে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জুম চাষিদের বিষয়ে আরেক বক্তা বলেন, বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় দেখা

যায়, জুম চাষিরা খাদ্যাভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাই তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় রেশন কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ে তাদের কোনো ফসল উত্তোলন কার্যক্রম থাকে না। এ সময়ে তাদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া আবশ্যক। যেমনটি করা হয় জেলেদের ক্ষেত্রে। তিনি দাবি করেন, সরকার যাতে জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তির পরিবর্তে দারিদ্র্য অনুপাতের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সুবিধাদি বিতরণ করে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

আশ্রয়ণের বাড়ি নির্মাণের বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল

আলোচকদের মধ্যে একজন উল্লেখ করেন, সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু যাদের নামে বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তাদের বাড়ি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ ১৫ হাজার টাকা করে নিচ্ছে। দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মানুষ এই ১৫ হাজার টাকা কোথায় পাবে? আরেকজন বক্তা উল্লেখ করেন, সমতলে ঘর বানানো আর পাহাড়ে ঘর বানানোর খরচ এক নয়। কিন্তু একটি ঘরের জন্য সমতলে যে বরাদ্দ, পাহাড়ি অঞ্চলের জন্যও একই বরাদ্দ। অথচ পাহাড়ে উপকরণ পরিবহন ব্যয় অনেক বেশি। ফলে বরাদ্দের বড় অংশই চলে যাচ্ছে পরিবহন ব্যয় বাবদ, যে কারণে ঘরের কাজ সরকারি বরাদ্দে সম্পন্ন হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সেসব মানুষকেই ঘর বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, যারা সরকারি বরাদ্দের অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, সেটি দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন। এতে করে যেসব নিঃস্ব মানুষের ঘর পাওয়ার কথা, টাকা দিতে না পারায় তারা সে ঘরগুলো পাচ্ছেন না। বরং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মানুষ ঘর পাচ্ছেন।

আরেক বক্তা উল্লেখ করেন, পাহাড়ে এক লাখ টাকায় কোনোভাবেই ঘর বানানো সম্ভব না হওয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও হেডম্যানদের মতো সামাজিক নেতারা এখন আর দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। পাহাড়ি অঞ্চলে একটি ঘর বানানোর জন্য কমপক্ষে দুই লাখ টাকা দরকার, কিন্তু বরাদ্দ আছে এক লাখ টাকা। এমন পরিস্থিতিতে উপজেলায় দায়িত্বরত ইউএনওরা এ কাজগুলো করছেন। এক্ষেত্রে অর্থের সংকট থাকায় ইউএনওরা তাদের কর্ম এলাকার মধ্যে গড়ে ওঠা ইটভাটা মালিকদের ডেকে তাদের বিনামূল্যে ইট সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন। আর ইটভাটাগুলো যেহেতু পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে গড়ে ওঠে, তাই ইটাভাটা মালিকরা প্রশাসনকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ইউএনওর অনুরোধে ঘর তৈরির নির্দিষ্ট স্থানে ইট পৌঁছে দিয়ে আসে, যে কারণে নির্মাণ খরচ অনেকটা কমে যায়।

সমতল থেকে পাহাড়ে বসতি স্থাপনকারী জেলে সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি বলেন, রাঙামাটি এলাকায় বছরের ৯ মাস মাছ ধরার অনুমতি আছে, বাকি তিন মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে। এই তিন মাসে প্রতিটি জেলে পরিবারের জন্য মাসে মাত্র ২০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুই বছর আগে এই তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা চার মাসে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এই এক মাস বাড়তি নিষেধাজ্ঞার জন্য বাড়তি চাল বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। এই সামান্য চাল দিয়ে জেলে পরিবারগুলোর চলতে অনেক কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে চালের বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানোর পাশাপাশি ডাল ও তেলের মতো খাদ্য উপাদান বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি।

বিভিন্ন জরুরি সেবার ঘাটতি

পাহাড়ি জনপদে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। পার্বত্য অঞ্চলের সব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই। ফলে কোথাও অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হলে তা নেভানো কঠিন হয়ে পড়ে। কয়েক মাস আগে বাঘাইছড়ি উপজেলায় এমন একটি ভয়াবহ অগ্নিকান্ড হয়েছিল এবং আশপাশে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন না থাকায় সেই আগুনের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়নি বলে বক্তারা জানান। এছাড়া রাত-বিরাতে

জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন হলে কাছাকাছি সেবা পাওয়ার সুযোগ নেই। রাঙামাটি সদর হাসপাতালেয়ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নেই। এখানে কোনো রোগী এলে তাকে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য আতঙ্ক ভূমিধ্বস

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন উল্লেখ করেন পাহাড়ে ভূমিধ্বস একটি মারাত্মক সমস্যা। ভূমিধ্বস বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাহাড়ি অঞ্চলে সাধারণত মে-জুন মাসে ভূমিধ্বসের সমস্যা দেখা দেয়। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষকে ভূমিধ্বসের হাত থেকে রক্ষার জন্য ৩০টির মতো আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে যখন ভূমিধ্বসের ঝুঁকি দেখা দেয়, তখন ঝুঁকিপূর্ণ ঘরবাড়িতে বসরবাসকারীদের সেখান থেকে আনা যায় না। তারপরও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্ভাব্য ভূমিধ্বসের ঝুঁকির সময়ে তাদের শেল্টার হাউসে আনার চেষ্টা করে এবং কিছুসংখ্যক মানুষ সেখানে আসেন। আর ভূমিধ্বসে মূলত সংঘটিত হয় অতিবৃষ্টির কারণে। এক্ষেত্রে সরকারি পরিমাপে বৃষ্টিপাতের যে মাত্রা ধরা পড়ে, বাস্তবিক পক্ষে বৃষ্টিপাতের মাত্রা তার চেয়েও অনেক বেশি, যেটা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত জরিপে ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ হওয়া প্রয়োজন। সেটা হলে সম্ভাব্য ভূমিধ্বসের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়া সহজ হবে বলে বক্তারা মনে করেন। বক্তারা উল্লেখ করেন, ভূমিক্ষয় ও ভূমিধ্বস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে আনারস চাষ। এক্ষেত্রে পাহাড়ে এমন ফসল চাষাবাদ উৎসাহিত করা উচিত, যা কম মাত্রায় ভূমিক্ষয় করে।

পাহাড়ে কাজ করা এনজিওর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ি অঞ্চলে কাজ করা এনজিওর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। মূলত তহবিল সংকটের কারণে এনজিওর সংখ্যা কমে আসছে। তাছাড়া নানা জটিলতার কারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো হিল ট্র্যাক্টসে কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বিশেষ করে কোনো অর্থ ছাড় করানোর জন্য প্রস্তাবটি আগে আঞ্চলিক পরিষদে আসতে হয়, তারপর সেটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন হওয়ার বিষয় রয়েছে। এই সার্বিক প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ। আর এনজিওর সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্থানীয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে যাচ্ছে। তাছাড়া সরকারি চাকরিতে আদিবাসী কোটা তুলে দেওয়ার ফলে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগও সীমিত হয়ে আসছে।

উন্নয়নের ফলে বাড়ছে নিরাপত্তার ঝুঁকি

আলোচনায় অংশ নিয়ে এক বক্তা উল্লেখ করেন, পাহাড়ি অঞ্চলে উন্নয়ন হচ্ছে না- এমন নয়। আমরাও চাই যে, উন্নয়ন হোক; কিন্তু উন্নয়নেরও বেশকিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। যেমন কোনো একটি গ্রামের পাশ দিয়ে একটি বড় সড়ক তৈরি হলো বা একটি তারকা মানের হোটেল নির্মিত হলো। যে এলাকায় সড়ক তৈরি হচ্ছে, তার আশপাশের গ্রামগুলোর নারীরা নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন। এমনকি যেসব পর্যটক পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরতে আসেন, আদিবাসী নারীদের প্রতি তাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। পর্যটন খাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে। অনেক পর্যটক পাহাড়ি মেয়েদের সম্মতি ছাড়াই তাদের সঙ্গে সেলফি তোলা বা এ-জাতীয় আচরণ করে থাকেন। এছাড়া পাহাড়ের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমতলের পর্যটকদের সে বিষয়ে তেমন ধারণা না থাকায় তারা এমন কিছু আচরণ করেন, যার মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নানা ভোগান্তির শিকার হয়। উদাহারণস্বরূপ তিনি বলেন, পাহাড়ে সুপেয় পানির তীব্র সংকট রয়েছে। সেজন্য স্থানীয়রা একটি নির্দিষ্ট স্থানে পানি জমিয়ে রাখেন। যেখানে পর্যটকদের

যাওয়া নিষেধ। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেই সুপেয় পানির আধারে স্নান করে সেটি পান করা ও ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলে। এতে স্থানীয়রা ভোগান্তির শিকার হন।

বাঙালি-পাহাড়ি সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে

বংশ পরম্পরায় পাহাড়ে বসবাসকারী এক বাঙালি অংশগ্রহণকারী বলেন, সাধারণভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও বাঙালিদের মধ্যে একটি দুর্ভেদ্য পর্দা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পাহাড়ে এখনো এক প্রকার সামরিক শাসন চলছে। আর পাহাড়ে বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী বাঙালিদের সঙ্গে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সখ্যতা থাকায় তাদের প্রশাসন সন্দেহের চোখে দেখে। তিনি পাহাড়ের ভূ-প্রকৃতি ও জনগোষ্ঠীর মনোভাব ও সংস্কৃতি অনুধাবন করে সে অনুযায়ী সেখানে শাসন প্রক্রিয়া পরিচালনার পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। এর একটি বড় অংশ একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পকেটে চলে যাচ্ছে। আর দরিদ্র জনগোষ্ঠী দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে উন্নয়নের নামে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, সে অর্থ কোথায় যাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি।

উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমন্বয়ের অভাব ও শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন

আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন পৌর কাউন্সিলর বলেন, উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ হয়তো একটি রাস্তা নির্মাণ করলো, এক সপ্তাহ না পেরোতেই দেখা যায়, সেখানে সরকারের আরেক সংস্থা তাদের পরিষেবা স্থাপনের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে। এছাড়া শহর পরিস্কার রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়, তা পৌর কর্তৃপক্ষের তহবিলে নেই। তাদের একমাত্র আয়ের উৎস হোল্ডিং ট্যাক্স। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যৎসামান্য অর্থ দেওয়া হয়। তহবিল সংকটের কারণ হিসেবে তিনি আরও উল্লেখ করেন, পৌর এলাকার ভিতরে যেসব হাট-বাজার রয়েছে, সেগুলো ইজারা দিয়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, জেলা প্রশাসন তা নিয়ে যায়। অথচ ওইসব হাট-বাজার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পালন করতে হয় পৌর কর্তৃপক্ষকে। এক্ষেত্রে পৌর এলাকার বাজার ইজারার অর্থ পৌর কর্তৃপক্ষের তহবিলে ন্যস্ত করার দাবি জানান তিনি। আর বর্জ্যগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও রিসাইকেলিংয়ের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে না পারায় সেগুলো কাপ্তাই লেকে নিপতিত হচ্ছে এবং লেকের পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি শহরবাসী সচেতন না হওয়ায় তারা যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে শহর নোংরা করে রাখে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এক্ষেত্রে নাগরিকদের স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা অভিযোগ করেন, পাহাড়ে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যেসব কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়, পাহাড়ের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। ফলে তারা এখানকার উপযোগী কর্মকান্ড পরিচালনায় ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে পাহাড়ের জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান আরেক বক্তা। একই সঙ্গে পাহাড়ে শিক্ষিত ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়লেও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আরেক বক্তা উল্লেখ করেন, পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে খুব সহজে যাতায়াত করা যায়, সেসব জায়গাতেই উন্নয়ন হচ্ছে। দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না। বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ে বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় সমন্বয়হীনতা রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ, ভূমি কমিশন, জেলা পরিষদ, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসসহ অন্যান্য যেসব সরকারি দপ্তর রয়েছে, তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় নেই। ফলে উন্নয়ন কাজে 'ওভারল্যাপিং' ঘটে। আবার জেলা সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্ট যাদের উপস্থিত থাকার কথা, তারা সবাই

উপস্থিত থাকেন না। তাছাড়া পরিকল্পনাগুলো গৃহীত হয় ঢাকায় বসে। ফলে তারা পাহাড়ের বাস্তবতা বোঝেন না। পাহাড়ের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা অনুধাবন করে, তবেই তা করতে হবে বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন।

আদিবাসী লেখায় সরকারের আপত্তি

বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে উল্লেখ না করতে সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুসারে কোনো পাহাড়ি নাগরিককে হেডম্যান বা অন্যরা আদিবাসী হিসেবে নাগরিক সনদ দিতে পারবেন না। এ বিষয়টি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের ওপর আঘাত বলে তারা মনে করেন। এছাড়া মাটি ক্ষয় হয় বলে পাহাড়ে আদা ও হলুদ চাষ করা যাবে না বলে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। অথচ সরকার নিজ উদ্যোগে বিপুল পরিমাণ পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করছে।

এনজিওর ক্ষুদ্রঋণের বোঝা

বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ে বিভিন্ন এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান নারীদের ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু এ ঋণের অর্থ তাদের হাতে থাকে না। তাদের স্বামীরা নিয়ে নেন। অনেকের স্বামী মাদকাসক্ত। ফলে মদ খেয়ে সেই অর্থ তারা শেষ করে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে এনজিওর প্রতিনিধি কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা নারীকে চাপ দিকে থাকেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, ঋণগ্রহীতা নারী নিজের মাথার চুল বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কিছুটা মানবিক ও সদয় হয়, সে বিষয়ে বক্তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বক্তারা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দেশনার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের দাবি জানান। আর সেই পরিকল্পনা প্রণীত হতে হবে স্থানীয় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করে। এটি করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে তারা মনে করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য বিভাজিতভাবে বিভিন্ন উপাত্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে জরিপ পরিচালনার প্রস্তাব দেন স্থানীয় প্রতিনিধিরা। জেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রস্তাব উঠে আসে। এছাড়া চতুর্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচিতে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে 'ট্রাইবাল হেলথ প্রোগ্রাম' চালু করার কথা বলা হয়েছে, সেটি বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। বক্তারা জানান, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে সরকারি চাকরিতে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় আদিবাসীদের কোটাও বিলুপ্ত করা হয়। এ কোটা পুনর্বহালের দাবি জানান বক্তারা। এছাড়া বান্দরবানের কয়েকটি উপজেলায় বিক্ষিপ্তভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। তাদের চিহ্নিত করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সরকারি চাকরিতে আছে, তাদের পদায়নের প্রস্তাব করা হয়।

সভার সমাপনী বক্তব্যে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ভারতের সংবিধানে কাশ্মীরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য যেমন ৩৭০ অনুচ্ছেদ ছিল, ঠিক তেমনিভাবে পার্বত্য অঞ্চলে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আর সেই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্যই শান্তিচুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এখন এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় নাগরিকদের কণ্ঠস্বর জোরদার করতে হবে এবং সেই কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পৌঁছাতে হবে। এজন্য আগামী এক-দেড় বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: মো. মাসুম বিল্লাহ

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

UNDP
UN environment
United Nations Environment Programme

KAPAEENG Foundation
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
HEKS EPER Bread for all.
Manusher Jonno Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption
WaterAid

www.bdplatform4sdgs.net
BDPlatform4SDGs
Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh
BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২২

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net